Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 171–179
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

স্বাধীনতাত্তোর নির্বাচিত বাংলা উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বরূপ সন্ধান

মাম্পি দেবাংশী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : mampi02021993@gmail.com

Keyword
স্বাধীনতাত্তোর উপন্যাস, মধ্যবিত্ত, সংকট, শ্রেণিমানসিকতা, যৌথতার ভাঙন, ঘুণধরা দাম্পত্য, স্বার্থপরতা, মূল্যবোধহীনতা, সংশয়, আত্মিক ও বাহ্যিক দ্বন্দ্ব।

Abstract
বাংলায় মধ্যবিত্তের উত্থান পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবের মত পরিবর্তনগর্ভ সামাজিক আলোড়নের মধ্য দিয়ে হয়নি, এ মধ্যবিত্ত মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক ও চাকুরীমুখী। ৪৭-এর স্বাধীনতা সঙ্গে করে নিয়ে এল উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক দিশাহীনতা, মূল্যবোধের ভাঙন। এর প্রভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরও বিবর্তন ঘটল; স্বাধীনতাত্তোরপর্বে নানারকম ক্লেদ, বৈষম্য, দ্বিধা, শূন্যতায় মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন জটিল থেকে জটিলতর ও সিদ্ধান্তহীন হয়ে পড়ল। এই পর্বের নির্বাচিত তিনটি উপন্যাসের মধ্যে মধ্যবিত্তের চারিত্র্য, শ্রেণিমানসিকতা, টিকে থাকার লড়াই, আত্মিক ও বাহ্যিক সংকট তথা স্বরূপের বহুমাত্রিকতা নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' এ উঠে এসেছে কলকাতার ভাড়াঘরে তিন প্রজন্ম নিয়ে বাস করা পরিবারের জোড়াতালি দেওয়া যৌথতার ভাঙনের বাস্তবতা। সেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের সুখের কথা ভেবে নিজেদের ছোট ছোট পৃথিবী গড়ে তুলতে চায়। ভাড়াঘরের সরু বারান্দার মত এদের মনগুলোও সংকীর্ণ হয়ে গেছে। এরা রোজগারে, ফাঁপা মহত্ত্বে, ঝুটো উদারতায় একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে চায়। প্রথাবদ্ধ সংস্কার মানতে পারে না আবার তার বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ করতে পারে না। এরা কেউ নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে মরে গিয়ে বাঁচে, কেউবা বাঁচা আর না-বাঁচার মাঝে জীবন্মৃত হয়ে ঝুলে থাকে, এটাই মধ্যবিত্তের ভবিতব্য।

নর-নারীর ঘুণধরা দাম্পত্যের টানাপোড়েনের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের অন্যতর স্বরূপকে তুলে ধরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর'। পঞ্চাশের দশকের অর্থনৈতিক ভাঙনের মুখে সংসারের হাল ধরতে মেয়েরা বাইরের দুনিয়ায় পা রাখছে, চাকরি করছে এবং তাকে ঘিরে সংস্কারাবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজে ও মনে নতুন দ্বন্দ্ব-সংকট তৈরি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ-এলিয়ট পড়া তথাকথিত উন্মুক্তমনা মধ্যবিত্ত বাঙালির মুখোশ খুলে দিয়েছে এই উপন্যাস। পাশাপাশি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নারী

অসুস্থ জীর্ণ সম্পর্কে সমস্ত কর্তব্যের ফাঁস ঢিলে করে দেবার কথা ভেবেও পিছিয়ে আসে শুধুমাত্র একটি আশঙ্কায়- 'লোকে কি বলবে'।

আত্মসুখপরায়ণ, স্বার্থসর্বস্ব মধ্যবিত্ত মানুষের বিরুদ্ধে নীরব নালিশ রমাপদ চৌধুরীর 'খারিজ'। বারোবছর বয়সী চাকর পালানের মৃত্যুকে ঘিরে মধ্যবিত্তের নিরাপত্তাহীনতা, মূল্যবোধহীন চূড়ান্ত স্বার্থপরতা ও গা-বাঁচানোর মানসিকতাকে পোস্টমর্টেমের মত ফালাফালা করে কেটে দেখা হয়েছে। সংসারে পালানরা আসে-যায়, তাদের মৃত্যুতে দুঃখ করাটা মধ্যবিত্তের কাছে অযথা 'সেন্টিমেন্ট'। এরা জেনেশুনে অন্যায় করে, পরে নৈতিকতার বেড়া তৈরি করে নিজেই নিজের বিচার করে, অপরাধবোধে ভুগতে থাকে, তারপর সেই অপরাধের দায় সমাজের উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। পরস্পরবিরোধী দুটো শ্রেণি বিপদে পড়ে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কীভাবে সমতলে এসে দাঁড়ায়- তার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে অদ্ভুত এক শ্রেণিমানসিকতা।

উচ্চবিত্তের আছে ধনের নিরাপত্তা, নিম্নবিত্ত পেট চালানোর জন্য কোনো না কোনো উপায় ঠিক বের করে নিতে পারে, এরই মাঝে মধ্যবিত্তের টিকে থাকার লড়াই। আর এই লড়াইকে ঘিরেই মধ্যবিত্তের যাবতীয় জটিলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়, সিদ্ধান্তহীনতা, সংকট। মধ্যবিত্তকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় ধরা যায় না, সময়-পরিবেশ-প্রতিবেশের পরিবর্তনে ভাঙা-গড়ায় তার নানা মুখ ভেসে ওঠে, স্বাধীনতাত্তোর এই তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তের স্বরূপ নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।

Discussion

মানুষের সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি কখনও একটি সরলরেখায় গড়ে ওঠেনি, ওঠেও না। নানা ওঠা-পড়া ও ঘাত -প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সভ্যতার প্রবহমান ধারা বয়ে চলে, যে ধারার মূল উদ্দীপক মানুষের জীবন সংগ্রাম। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংগ্রাম পদ্ধতিরও বদল ঘটেছে। আর এই পরিবর্তনের নিয়ন্তা হল সমাজে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থা, যা জীবনধারণের তাগিদে মানুষকে গ্রহণ করতে হয়। তার মধ্য দিয়েই সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বলাবাহুল্য, এই সম্পর্ক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, আর এই সম্পর্ককে ভিত্তি করেই সমাজেই শ্রেণি-বিভাজন।

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র – মানুষকে এই চারটি বর্ণে ভাগ করা হত। পরবর্তীতে সমাজ উন্নত হয়েছে, সমাজে শ্রেণিবিভাজনের মাপকাঠি হয়েছে বিত্ত বা সম্পদ। এই বিত্তের হিসাবে যার স্থান মধ্যবর্তী স্তরে অর্থাৎ একেবারে উপরেও নয় আবার নীচেও নয়, মাঝামাঝি স্তরে– একেই বলে মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle class)। আধুনিক বাংলার ইতিহাসে মধবিত্ত শ্রেণি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। উনিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের বর্তমান দশক পর্যন্ত বাঙালির যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু শ্লাঘনীয়, যা কিছু বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার পিছনে রয়েছে এই শ্রেণির অবদান। সমাজবিজ্ঞানীরা এই শ্রেণিকে বলেছেন 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তনকারী'। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি, তাদের সংগ্রাম, তাদের মানসিকতা, তাদের চারিত্র্য কীরকম, কী ধরনের বাহ্যিক ও আত্মিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয় তাদের– তা আমাদের মনে জিজ্ঞাসা তৈরি করে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্রধর্ম ও শ্রেণিমানসিকতা লক্ষ করার মত। এদের একদিকে সমাজের উপরের স্তরে উঠতে চাওয়ার প্রবল ইচ্ছে কিন্তু উঠতে না পারা আবার নিচের স্তরে স্খলিত হয়ে পড়ার ভয় ও আশঙ্কা– এই দুইয়ের ফলে মানুষগুলির ভিতরে-বাইরে তৈরি হয় একধরনের জটিলতা। ছোট পৃথিবী, সংকীর্ণ পরিগণ্ডি, ছোট ছোট স্বার্থবোধ, টিকে থাকার লড়াই, সুনিশ্চিত নিরাপত্তার এষণা- এসব নিয়ে মধ্যবিত্তের জীবনে নানা ওঠাপড়া লেগেই থাকে। পরিবার–প্রতিবেশী, দাম্পত্য সম্পর্ক, নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পুণ্য নিয়েও এদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য দুই শ্রেণি থেকে পৃথক।

স্বাধীনতার আগে ও পরে মধ্যবিত্ত চরিত্র বহু উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। জগদীশ গুপ্তের 'লঘুগুরু', 'দুলালের দোলা', আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', 'মোমের পুতুল', বিমল করের 'খড়কুটো', 'পূর্ণ–অপূর্ণ', সমরেশ বসুর 'বিবর', 'কুবেরের বিষয় আশয়' প্রভৃতি উপন্যাসে সে ছাপ স্পষ্ট। তবে

স্বাধীনতাত্তোরকালীন উপন্যাস এক্ষেত্রে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে; কারণ ৪৭ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, রাজনৈতিক দিশাহীনতা বিশেষত মূল্যবোধের ভাঙন বাঙালি জীবনকে অস্থির করে তোলে। নানারকম ক্লেদ, দ্বৈধতা, বৈষম্য, শূন্যতায় ছেয়ে যায় বাঙালির মন, জীবন হয়ে ওঠে ভারাক্রান্ত, জটিল, সিদ্ধান্তহীন। আমাদের নির্বাচিত তিনটি উপন্যাস (নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মীরার দুপুর', রমাপদ চৌধুরীর 'খারিজ') -এ এসবকিছুর নিখুঁত রূপ ধরা পড়েছে, পাশাপাশি তিন লেখকের প্রতিনিধিস্থানীয় এ তিনটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বরূপের বহুমাত্রিকতা।

মধ্যবিত্তের স্বরূপকে বুঝতে হলে আগে জানতে হবে বাংলায় মধ্যবিত্তের উদ্ভব কীভাবে হয়েছে? শ্রেণি হিসেবে বাংলার অনেক আগেই পাশ্চাত্যে মধ্যবিত্তের উত্থান ঘটেছিল। ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের রানী ক্যারোলিন সর্বপ্রথম 'Middle class'– এই phrase টি ব্যবহার করেন। বাংলায় 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি পাই অনেক পরে– বিশ শতকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে নতুন পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাতেই দেখা দেয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। এই নতুন উদ্ভূত শ্রেণির গুরুত্ব বোঝাতে সমাজবিজ্ঞানী A.F.Pollard বলেছেন –

> "...you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation."[১]

কিন্তু বাংলায় মধ্যবিত্তের উদ্ভব এভাবে হয়নি। মুঘল যুগে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা থাকলেও বাণিজ্য ও পেশাভিত্তিকভাবে শিক্ষক, পুরোহিত, কারিগর, শস্য ব্যবসায়ী, সেরেস্তা, দোকানদার প্রভৃতি মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্ব ছিল, তবে পৃথক কোনো সামাজিক গোষ্ঠী বা শ্রেণি হিসাবে এদের কোন স্থান ছিল না।

১৭৯৩–এ লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে পুরনো জমিদারশ্রেণির জায়গায় নতুন জমিদারশ্রেণির উদ্ভব হয়। এরা তাদের মালিকানাস্বত্বের জোরে পত্তনিদার, ইতমমদার, গাঁতিদার, তালুকদার প্রভৃতি পরগাছার সৃষ্টি করেন, যারা সমাজে নিম্নবিত্তদের চেয়ে বেশি সুযোগ- সুবিধা পায় আবার তারা উচ্চবিত্তও নয়। ইকতিদার আলম খানের ভাষায় এদের আমরা 'আধুনিক মধ্যবিত্তের পূর্বসূরী'[২] আখ্যা দিতে পারি কারণ এরাই বাংলায় মধ্যবিত্তের উত্থানের পথ তৈরি করে দেয়। মেকলে মিনিটের (২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫খ্রিঃ) পরই মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এতে টি.বি মেকলে বলেন-

> "I feel with them that it is responsible for us, with our limited means to attempt to educate the body of the people. We must at present do our best form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern – a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect."[৩]

এদের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে একদল ইংরেজি ডিগ্রিধারী বাদামি সাহেব গড়ে তোলা, যারা বিদেশি শাসক ও এদেশি শোষিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে, যারা রক্তে হবে ভারতীয়, আদর্শে ইংরেজ। সরকারি চাকরি হস্তগত করার চেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষিত উকিল, ডাক্তার, কেরানি, মোক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপকরাই হলেন মধ্যবিত্ত। তবে মধ্যবিত্ত বলতে শুধুমাত্র ইংরেজি জানা চাকুরীজীবীদেরই বোঝায় না, জমি ব্যবসা - বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষ যারা স্বচ্ছল জীবনযাপনের তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে নানা পেশাদারী কাজকর্ম ও ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে কাজকারবারে যুক্ত হয়েছিলেন (যেমন- আড়তদার, দালাল, ফড়ে ব্যাপারী প্রভৃতি) তারাও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাংশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে একটানা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি নানান অস্থিরতায় মানুষ, মানুষের জীবন-সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি, তার প্রেম-যৌনতা, মন-মানসিকতা সবকিছুই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়। বিশেষত দেশভাগের ফলে কলকাতার মধ্যবিত্তের বহুলাংশের পূর্ব বাংলার গ্রামীণ শিকড় ছিঁড়ে যাওয়ায়, তারা হারিয়ে ফেলল অর্থনৈতিক স্থিরতা। মাতৃত্ব, নারীত্ব, সতীত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলিকে এতদিন জীবনে বড় করে দেখা হয়েছে সেগুলি ভাঙতে লাগল কলকাতার ফ্ল্যাটে, ভাড়াঘরে, রাস্তায়। আর তারই প্রতিরূপে ক্রমশ এক শূন্যতার ছায়া মেশানো নায়ক-নায়িকা নিয়ে কথাসাহিত্যের নৌকা ভরেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরীর মতো কথাকারেরা।

স্বাধীনতাত্তোরকালের মধ্যবিত্ত মানুষ মধ্যবিত্ত জীবন, তাকে ঘিরে আশা-নিরাশার আত্মিক সংকট এসবকে কলমে তুলে ধরেছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তুলনা টেনে সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন-

> "শরৎচন্দ্র যেমন একদিন তাঁর কালের বাঙালি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তের একেবারে প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক ছিলেন, নরেন্দ্রনাথও তেমনি একটা বিশেষ সময়ে ঠিক ওই সমাজেরই প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক হয়ে উঠেছিলেন।"[৪]

আলোচ্য 'চেনামহল' (১৯৫৩) উপন্যাসের প্রেক্ষাপট আমাদের চেনা কলকাতা শহর, গ্রাম থেকে উঠে আসা তিন প্রজন্মের একটি একান্নবর্তী পরিবারের জোড়াতালি দেওয়া যৌথতার ভাঙনের ছবি এতে স্পষ্ট। প্রথম প্রজন্ম ভুবনময়ী অতীত আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চান, স্বামীর মৃত্যুর পর ছেলেমেয়েকে নিয়ে এক বাড়িতে থাকতে চেয়েছিলেন, বাসন্তী ও বৈদ্যনাথের বিরোধের চূড়ান্ত পর্বে একমাত্র তিনিই যৌথ রয়ে গেলেন আসলে এক জায়গা থেকে শিকড় উপড়ে এনে নতুন জায়গায় অন্য পটভূমিতে ছিঁড়েখুঁড়ে যাওয়ার শিকড়গুলিকে একত্রিত করতে চান তিনি। পরিবারের মেয়েদের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাবের তিনি রক্ষক। শহুরে মধ্যবিত্ত এই পরিবারের মাথা দুজন পুরুষ - বৈদ্যনাথ ও অবনীমোহন সংসারের ঘানি টানতে টানতে এরা হিমশিম খেয়ে যায়, অন্যের তুলনায় নিজেকে নিজের কাছে বড় করে দেখে –

> "ওরা ছোট হতে পেরেছে বলে পাল্লা দিয়ে আমিও ছোট হব?"[৫]

অথচ সংসারের প্রাত্যহিক অশান্তিতে তাদের দুজনেরই গলা শোনা যায়। সন্তানপালনের প্রতিযোগিতায় বৈদ্যনাথের মধ্যবিত্ত মন অবনীকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখে যে কিনা নিরন্তর তার কাছে হেরে চলেছে। বৈদ্যনাথের দুর্বলতা বিজু, সন্তানকে ঘিরে তার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা। সংস্কারাবদ্ধ মন নিয়ে সে মামাতো-পিসতুতো ভাইবোন বিজু-প্রীতির প্রেমের সম্পর্ক মানতে পারেনা। হিন্দুসমাজ অস্বীকৃত এ সম্পর্ক বৈদ্যনাথের চোখের কাঁটা। আর এই কাঁটাকে সমূলে উপড়ে ফেলে ছেলেকে বাঁচাতে সে প্রীতির বিয়ের আয়োজনে তৎপর হয়, স্ত্রীকে পাশে নিয়ে তার স্বার্থপর মনের পরিকল্পনা –

> "চোখের আড়ালে গেলেই মনের আড়ালে যাবে। ভাগ্নির বিয়ের জন্য যদি গাঁট থেকে দু-একশ টাকা নেমে যায় সেও ভালো।"[৬]

সত্যিই কি তা হয়? মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েও তার ভাবনাচিন্তা প্রথাবদ্ধ –

> "পড়াশুনায় কি হয়... মিছিমিছি স্বাস্থ্য খোয়ানো, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের শরীরের যা অবস্থা তার উপর একরাশ বই চাপিয়ে ওদের চিরকালের জন্য একেবারে পঙ্গু করে দেওয়া হয়।"[৭]

তার চেয়ে শরীরখানা বেঁচে থাক বাসন্তীর মতো ক্লান্ত ঊর্বশী হয়ে বছর বছর সন্তান উৎপাদনের জন্য।

বৈদ্যনাথ এর বিপরীতে থাকা অবনীমোহন আড়াইশো টাকা মাইনেতে গ্রাম থেকে আসা বেকার ভাই ও তার স্ত্রী সহ বেকার পুত্র সংসারের সকলের ভার স্বেচ্ছায় আপন কাঁধে তুলে নিয়েছেন। পয়সার অভাবে অপূর্ণই রয়ে গেছে ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে, তবু সেই ইচ্ছেটাকে অন্যভাবে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। পঁয়তাল্লিশ টাকার ভাড়াঘরের ছোট্ট খুপরির দৈনন্দিনতার মাঝে মহত্ত্বের অনুশীলন করে চলেন তিনি, যদিও সেই মহত্ব ফাঁপা বেলুনের মতই। তিনি যে সংসারের গন্ডির মধ্যে আত্মসমর্পণ করেননি, হৃদয়ের পরিধি ছোটো হতে দেননি– এতেই তার গর্ব, তার আত্মপ্রসাদ। তার পরেও অবনীর মনে আছে এক বিশ্বাসহীনতা, ব্যর্থতাবোধ। বৈদ্যনাথের মত করে সংসারকে আঁটোসাঁটো করে বাধতে না পারার ব্যর্থতাবোধ, অতুল-অরুণকে ঠিক মতো মানুষ করতে না পারার ব্যর্থতাবোধ, সংসারের প্রতি মৃগাঙ্কর ছাড়াছাড়া ভাবের বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারার ব্যর্থতাবোধ– এসব কিছু নিয়ে অবনীর মন সর্বদাই দ্বিধাগ্রস্থ ও আশাহীন। মধ্যবিত্ত মানুষ প্রবল কষ্টের মধ্যেও নিজেদের ছোট ছোট শখ রুচিশীলতাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে-এ মধ্যবিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, মৃগাঙ্ক ও তার স্ত্রী কিংবা করবীর মধ্যে তা স্পষ্ট। করবী অরুণের প্রতি তার দুর্বলতাকে অস্বীকার করেছে, করবীর মনের দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত আত্মপ্রবঞ্চনা তার সামনে কর্তব্যের, বিবেকের ছদ্মবেশ পরে এসেছে।

উপন্যাসের তিনটি প্রেমের সম্পর্ক,তিনটিই প্রথাবদ্ধ সমাজ অস্বীকৃত। বাবা-মায়ের বাধ্য ছেলে বিজু কোন কিছুতেই জোর গলায় প্রতিবাদ করতে পারে না। প্রীতির সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবার হয়নি, তাই সে বলেছে -

> "আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।কিন্তু একসঙ্গে বেঁচে থাকায় অনেক বাধা,...আমরা একসঙ্গে মরবো প্রীতি।"[৮]

মধ্যবিত্ত এই যুবক আত্মহত্যায় নিজের যন্ত্রণার মুক্তি ঘটিয়েছে, তার শেষ স্বীকারোক্তি-

"আমার মৃত্যুর জন্য আমার দুর্বলতাই দায়ী।"[৯]

তবে এ দুর্বলতা তার একার নয়, দীর্ঘকাল ধরে তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রবহমান। উপন্যাসের সকল চরিত্রের মধ্যে মধ্যবিত্তীয় সংস্কার-দ্বন্দ্ব কাজ করলেও অতুল আগামীর জন্য চিন্তাহীন, লোকচক্ষুর পরোয়া সে করে না। তাই সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে সে রমাদিকে নিয়ে বাড়ি ছাড়তে পেরেছে। বিজু-অতুল এদের দুজনের মধ্যে ঝুলে রয়েছে অরুণ। প্রচলিত সংস্কার সে মানতে চায় না আবার প্রত্যক্ষভাবে তার বিরুদ্ধেও যেতে পারে না। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অরুণের মত সতত দ্বিধাদ্বন্দ্বে খন্ডিত। প্রথমে সে দোলাচলতায় ছিল করবীর বাড়ি যাবে কি যাবে না, পরবর্তীতে করবীকে তার মনের কথা বলবে কি বলবে না, শেষে করবীকে সে কীভাবে গ্রহণ করবে, করবীর সন্তানের পিতৃপরিচয় কী দেবে? অরুণ না পারে বিজুর মত মরতে, না পারে অতুলের মত পালিয়ে বাঁচতে। বিজুর মৃত্যু তার মনে প্রশ্ন জাগায়- প্রেম কি কেবল শক্তিমানের জন্য? তার দুর্বলতা, সংশয়, দ্বৈধতা, ভয় প্রতি পদক্ষেপে তার পা জড়িয়ে ধরেছে, তাকে সিদ্ধান্তহীন করেছে।

আলোচ্য উপন্যাসের অরুণ কোন বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়; তার একাকিত্ব, আত্মমগ্নতা, দেবার ও নেবার অক্ষমতা ও তার একার নয়। এর লক্ষণগুলি অরুণের কালের, অরুণ একটা কালের প্রতিনিধি। যাইহোক, আত্মসুখে ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ একান্নবর্তী পরিবারগুলোকে ভেতর থেকে ভেঙে চুরমার করেছে। সম্পর্কের শেষ গ্রন্থি ছিঁড়ে সমাজ ও মানবিক অনুভূতি বিচ্ছিন্ন দুর্গত মানুষের জন্ম হচ্ছে- এমন এক সর্বস্বহারানো মানবিক সংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্র চলমান জীবনের ছবি আঁকতে আঁকতে ভাঙনের মধ্যেও মানবিক সম্পর্ক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অন্য ছবি আঁকলেন, যা জীবনের অর্থকে নতুন মূল্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তত্ত্ব বা দার্শনিকতা নয়, সহজ-সরল কাহিনি ও নিখুঁত পরিবেশনায় যৌথ পারিবারিকতার মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের স্বরূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাঙালি, বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মজীবনীর আধুনিক পর্বটির নির্ভরযোগ্য আর্কাইভ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্য। অন্তর্মুখী(Introvert) মানুষ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রসিকতা করে বলেছিলেন -

"চশমার পাওয়ার বেশি বলেই হয়তো তাঁর দৃষ্টি সবসময় গাঢ় ও মর্মভেদী...।"[১০]

সত্যিই চল্লিশের দশকের এই লেখক মধ্যবিত্ত মানুষের মনকে তলিয়ে দেখেছেন। মধ্যবিত্ত জীবন, মধ্যবিত্তের সংকট, অবক্ষয়, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, অনিশ্চয়তা— মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বরূপকে খুব কাছ থেকে অনুভব করেছেন তিনি। 'মীরার দুপুর' (১৯৫৩) উপন্যাসে স্বাধীনচেতা এক নারী উল্টোদিকে ঈর্ষা-হীনমন্যতায় পূর্ণ এক পুরুষ-দু'জনের ভাঙা দাম্পত্যের পটভূমিতে স্পষ্ট হয়েছে মধ্যবিত্তের এক অন্য স্বরূপ।

শহুরে আত্মসচেতন ঈর্ষাকাতর কয়েকটি মানুষ ও তাদের মানসিকতা নিয়ে 'মীরার দুপুর' ঘটনাশ্রয়ী নয়, ভাবনাশ্রয়ী উপন্যাস। উপন্যাসের বস্তুশরীর নির্মাণের জন্য লেখক এখানে ঘটনা সংস্থাপনের চিরাচরিত পদ্ধতির আশ্রয় নেননি, তার পরিবর্তে পাত্রপাত্রীর মধ্যবিত্তীয় ভাবনাস্রোতকে অবলম্বন করেই তিনি তার বলার বিষয়কে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। হীরেনের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করেই উপন্যাসে নানা আবর্তের সৃষ্টি। কেননা তার অসুস্থতা কেবল শরীরের সীমায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, ধীরে ধীরে সংক্রামিত করেছে তার ভাবনা ও মনকে। মীরার সুস্বাস্থ্য তার হিংসার অন্যতম কারণ-

"রাত করে পুরো দুই ড্রাম জল ঢেলেও তোমার অসুখ করে না তোমার কি একদিনও অসুখ করবে না, এমন নিটোল দীপ্ত স্বাস্থ্য আমি আবার কবে ফিরে পাব কে জানে।"[১১]

সংসারে রোজগারের জন্য মীরা চাকরি নেয়, অফিস যায়- হীরেনের কাছে বিষয়টা এতটা সহজ নয়। নিজের স্ত্রীকে রান্নাঘর এবং শোবার ঘরে দেখতেই তার ভালো লাগে, সেই স্ত্রী চৌকাঠ পেরিয়ে তার থেকেও বেশি মাইনের চাকরি করবে এটা সে মানতে পারেনা –

" 'তুমি বলেই সম্ভব হলো, আমি হলে পারতাম না মীরা।' সেই উচ্ছ্বাসের আড়ালে না পারার ঈর্ষা হিংসা হীনতার যন্ত্রণা পুরুষের কুটিল চোখকে শাণিত করে দেয়।"[১২]

সে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘড়ির উপর চোখ রেখে প্রহর গোনে- কখন মীরা ফিরবে? ভালোবাসার ফাঁস তো আগেই পরিয়েছিল এখন তার মন পরিকল্পনা করে মীরাকে ঘরে আটকে রাখতে মাতৃত্বের বেড়ি পরানোর কথা –

"যদি ঘরে শিশু থাকতো তো এই মীরা কক্ষনো এতক্ষন বাইরে থাকত না, ছুটে আসত।"[১৩]

কিন্তু সেখানেও সে ব্যর্থ, দূর থেকে সায়া আর জংলি কাপড়ের ব্রেসিয়ার পরা মীরাকে দেখা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ-এলিয়ট পড়া হীরেনের মনে সারাদিনে নানা প্রশ্ন জমা হয়- মীরা কার কাছে টাকা ধার করছে? সে বন্ধু পুরুষ না মহিলা? বাড়ি ফেরা মাত্রই মীরার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর মেপে নেয় কড়ায়-গণ্ডায়। প্রশ্নজর্জরিত মীরা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে হীরেন দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলে, বাছা বাছা নীতিবাক্যগুলো ইঁট-কাঠ-পাথরে ধাক্কা খেয়ে গুমগুম করতে থাকে। আধুনিক মনিবানীর আধুনিক ঝি মালতী, বন্ধু বিপদ কিংবা প্রতিবেশী ভাড়াটে মৃগাঙ্ক- এদের কাছে প্রয়োজনের সময় অর্থসাহায্য পেয়ে মিথ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিনয় করে হীরেন। এমনকি স্ত্রীর বাড়ি ফিরতে রাত হলে খাওয়া বন্ধ করে পেটে ব্যথার ভান করে, টেবিলে ঘুমের ওষুধ রেখে নীরব শাসানি ছুঁড়ে দেয়। স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ মধ্যবিত্তীয় সংকীর্ণতা হীরেনের মনকে সর্বদা অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে এবং শেষপর্যন্ত আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়।

সম্পর্কের অপর প্রান্তে মীরা, আর্থিক নিরাপত্তাপূর্ণ এক স্বচ্ছল জীবন তার কাম্য, কিন্তু সে ইচ্ছে তার অধরা। তার চাওয়ার অনেক বেশি সে অমরেশ এর কাছে পেয়েছে, অমরেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সে আপশোশ করেছে- কেন বিয়ে করল? কেন সে অমরেশকে ছেড়ে হীরেনকে বেছে নিল? প্রতিরাতে স্বামীর জেরায় জর্জরিত মীরা ভাবে এবার একটু একটু করে কর্তব্যের গিঁট আলগা করে দেবে। কিন্তু পারে কই? অমরেশ যখন তাকে বিয়ের সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে আসতে বলে তখন মীরার উত্তর- 'খারাপ দেখায়'। আসলে লোকচক্ষুর ভয়-সঙ্কোচ স্মার্ট আধুনিকা কলেজ পাশ করা মীরার মধ্যেও কাজ করে গেছে। হীরেন তাকে কোনদিনও বুঝতে পারেনি- না মনে, না শরীরে। তবুও মধ্যবিত্তীয় সংকট ও লোকলজ্জার কারণে হাজারবার ভেবেও হীরেনকে সে ছাড়তে পারেনি। আর সে যা পারেনি মালতি তা করে দেখিয়েছে। নিম্নবিত্ত মালতী লোকচক্ষুর পরোয়া করে না, স্বামীর সঙ্গে থাকতে না পেরে অন্য মানুষের সঙ্গে নতুন করে সংসার পেতেছে। মীরা তাই মালতীকে মনে প্রাণে সমর্থন করে। অল্প পরিসরে হলেও মালতীর চরিত্রটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ, হীরেনের crisis আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তারই প্রশ্নে -

> "এই যে ঘরে ঘরে দিদিমণিরা সব বাইরে যাচ্ছে, দিনভর বাইরে থাকছে, চাকরি করছে... দাদাবাবুরা কেউ মন খারাপ করে মুখ ভার করে বসে আছে কি?"[১৪]

অমরেশ কিংবা হীরেন কেউই মীরার যোগ্য পুরুষ হয়ে উঠতে পারেনি। একদিকে হীরেন ঈর্ষা, সন্দেহ ও হীনতার আঁকশি দিয়ে ঘরের প্রেমকে ঘরোয়া করে বেঁধে রাখতে চায়, অন্যদিকে অমরেশ অর্থ, উদারতা ও ত্যাগের দাঁড়িপাল্লায় মীরার প্রেমকে ওজন করতে আগ্রহী। দুজনই ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গোঁড়া, দুজনের প্রেমের ক্ষেত্রে রক্তমাংসের মীরা অনুপস্থিত। শিথিল দাম্পত্যে মীরা হীরেনের মুখে দেখে হলুদ আচারের হাসি, উল্লেখ্য হলুদ রং-কে খ্রিস্টানরা অবিশ্বাস ও অনৈতিক প্রেমের প্রতীক বলে মনে করেন। মনের ক্ষুধায় আরও এক যোগ্য পুরুষের সন্ধান মীরাকে টেনে নিয়ে গেছে মৃগাঙ্কর দিকে। আর্টিস্ট মৃগাঙ্ক নতুন প্রেরণার মুখ তখন মীরা আর মীরা তা ভাঙতে চায় না। তাই হীরেনের মৃত্যুকে একরকম ভাবে পুলিশের সামনে আর অন্যরকম ভাবে মৃগাঙ্ক কাছে তুলে ধরে।

বিয়ে-ভালোবাসা এসবে বিশ্বাসী নয় অমরেশ। কলেজের পুরনো বান্ধবীদের আর্থিক সাহায্য করে দেখাতে চায় সে কত বড়। বান্ধবীকে মূল্যবান উপহার দিয়ে পেতে চায় তাকে আর তাতে বিফল হলে বান্ধবীকেই অকৃতজ্ঞ-স্বার্থপর বলে দোষারোপ করে। আসলে অন্যকে করুণা করে নিজেকে বড় ভাবা এবং নিজের হাজারো ত্রুটি এড়িয়ে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো- এসবই মধ্যবিত্ত মানুষের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য। অমরেশ নিজের মধ্যবিত্তীয় সংস্কার বোধ থেকে শেষপর্যন্ত মীরাকে হীরেনের ঘর ছাড়তে বলেনি বরং চেষ্টা করে সেবায়-শুশ্রূষায় নিজের সংসারকে আবার ভরিয়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছে। পঞ্চাশের দশকের ভাঙনের মুখে অর্থনৈতিক সংকট ঘোচাতে মেয়েরা গৃহবধূরা বাইরের দুনিয়ায় পা রাখছে এবং তা থেকে এতদিনের মধ্যবিত্ত সমাজেও মনে নতুন সংকট তৈরি হচ্ছে তার প্রভূত উদাহরণ হীরেন। সমাজ ও দাম্পত্য নিয়ে মীরা অনেক কথাই ভেবেছিল কিন্তু স্বামী কিংবা প্রেমিক সবার চোখেই সে শুধু কর্তব্যপালনের যন্ত্র। মীরা স্বাধীনভাবে ডানা মেলে উড়তে চেয়েছিল, পারেনি। মানবিক সময়ের বাইরে জড় ও জীবের যে প্রাকৃতিক সময় তাকে ছুঁয়ে সামাজিক সময়ের বাইরে এক দ্বিতীয় সময় রচনা করেছেন লেখক আর সেই সময়ই 'একলা দুপুর' হয়ে, মধ্যবিত্ত নারীর নিজের পরিসর হয়ে ধরা দিয়েছে মীরার কাছে।

চল্লিশের দশকের শেষভাগে কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর পথচলা শুরু। ১৩৮১ সালের শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ পায় 'খারিজ'। উপন্যাসটি মাত্র পনের দিনের মধ্যে লেখা হলেও উপন্যাসের পরিকল্পনা পনের বছর পুরনো। আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখপরায়ণ, বিবেকহীন মধ্যবিত্ত মানুষের বিরুদ্ধে এক নীরব নালিশ হল 'খারিজ'। উপন্যাসের একটি সাধারণ লোকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্তের ঘুণ খাওয়া মূল্যবোধের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন নির্মমভাবে, সওয়াল তুলেছেন তথাকথিত সমাজব্যবস্থা সমাজনীতির বিরুদ্ধে। স্বার্থের তাগিদে ও নিজেদের গা বাঁচাতে মধ্যবিত্তেরই দুটি উপশ্রেণির এক সিঁড়িতে এসে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের স্বরূপকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এই উপন্যাসে।

সাতটি অধ্যায় সম্পূর্ণ 'খারিজ'- তার কেন্দ্রে রয়েছে পালান নামে একটি বালক ভৃত্যের মৃত্যু ও তাকে ঘিরে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী জয়দীপের নিরাপত্তাহীনতা, মিথ্যাচারিতা, স্বার্থপরতা। শীতকালের এক কর্মব্যস্ত সকালে বন্ধ রান্নাঘরে পালানের নিঃশব্দ জড় উপস্থিতি, প্রথমেই জয়দীপের মাথায় যে কথাগুলো আসে –

> "সাবধান সাবধান! থানা, পুলিশ, আইন, পাড়াপড়শির মন্তব্য।"[১৫]

দরজা ভাঙতেই পালানের নিথর মৃতদেহ, তবুও কোনমতে ডাক্তার ডেকে এনে পালানকে বাঁচানোর প্রবল চেষ্টা করে জয়দীপ - পালান বেঁচে উঠুক, পালানের বেঁচে ওঠা খুব দরকার। কেন দরকার? জয়দীপের নিজের পরিবারিক নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক সুস্থির জীবন যাপনের জন্য। যে জীবন আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত, যে জীবন একদিকে বাইরের জগতের সঙ্গে আর একদিকে নিজেই নিজের সঙ্গে লড়ে চলে উপন্যাসের নায়ক জয়দীপ এর মধ্য দিয়ে তারই ভাষ্যরচনা করেছেন কথাকার। আধুনিকা অদিতির সংসারে একটা বালক ভৃত্য অত্যন্ত প্রয়োজন পালানের আকস্মিক মৃত্যুতে অদিতির দুঃখবোধ জয়দীপ এর কাছে- 'অযথা সেন্টিমেন্ট'। এই একটি মৃত্যুর আয়নায় জয় নিজেকে ভালো করে চিনে নিয়েছে, আত্মবিশ্লেষক হয়ে উঠেছে। দেখেছে প্রথমে সে পালানকে বাঁচানোর জন্য উদ্যোগ নেয়নি বরং তার আগে একজন সাক্ষী জোগাড়ে তৎপর হয়েছে। নিজেকে বাঁচাতে কখনো সে সব দোষ চাপাতে চেয়েছে স্ত্রী অদিতির ওপর, কখনো বাড়িওয়ালার ওপর, কখনোও বা পালানের অশিক্ষা, পালানের বাবার ওপর কিংবা ওই বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থা – সবের ওপর দায় চাপিয়ে নিজের হাত পা ঝেড়েছে। বিপদে পড়ে পুলিশ, সারাবছর তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বাড়িওয়ালার সামনেও অতি বিনয়ী সেজেছে। আর পুলিশ, বাড়িওয়ালা, প্রতিবেশীরা চলে যাবার পর শুরু হয় জয়দীপের নিজের কাছে নিজের জবাবদিহি। আসলে বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবী সবকিছুতেই সন্দেহ ও বিশ্বাসহীনতার দাগ লাগিয়ে দেয়। অন্যের কথা দূরে থাক, মানুষ নিজেই নিজের ওপর বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেনা।

এতকিছুর পরেও জয়দীপের মনে কোথাও একটা খারাপ লাগা থেকে যায়। নিজের ছেলে টুকাই ধোপদুরস্ত ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাচ্ছে আর তারই পাশে নোংরা জামাপরা বইভর্তি ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে নিয়ে চলেছে- এই ছবি বারবার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু এর জন্য প্রকৃত দায়ী কে? এই সমাজ নাকি পালানোর বুড়ো বাবা? উপন্যাসের ষষ্ঠ অধ্যায় একরকমভাবে তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা আছে। সেখানে জয়দীপের সুপ্ত অপরাধবোধের প্রকাশ ঘটেছে কাফকার 'ট্রায়াল' কিংবা লুই ক্যারলের 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এর আদলে গড়া সেই চূড়ান্ত অ্যাবসার্ড কাল্পনিক বিচারসভার দৃশ্যে, যেখানে জয়দীপ, অদিতি, রায়বাবুসহ অগণিত দর্শক অপেক্ষা করে থাকে করোনারের রায় শোনার জন্য, হাত তাদের মধ্য থেকেই লাফিয়ে উঠে এক উন্মাদ চিৎকার করে বলে –

> "অনেককাল চুপ করে আছি। আর চুপ করব না। দেশে দারিদ্র্যের কথা আপনারা কেউই বলছেন না। কেন ওই বুড়ো লোকটিকে মাত্র কুড়িটি টাকার জন্য তার একমাত্র ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে হয়েছিল? যে বয়সে ওই ছেলেটির নিজেরই স্কুলে যাবার কথা সে বয়সে কেন তাকে সান্যাল দম্পতির পুত্রের স্কুলব্যাগ নিয়ে যেতে হয়? কেন জয়দীপ ও অদিতি ভৃত্যটিকে ভালো মাইনে, গরম বিছানা দিতে পারেন না।"[১৬]

বোঝাই যায়, এ উন্মাদ কে? এই প্রলাপ আসলে পালানের সঙ্গে নিজের পরিবর্তিত সম্পর্কের নিরিখে বিচারসভার একমাত্র নীরব দর্শক জয়দীপের স্বগতোক্তি।

আগাগোড়া উত্তম পুরুষে লেখা উপন্যাসটি জয়দীপের দৃষ্টিকোণে বর্ণিত। জয়দীপের সংসারে একাধিক পালান আসে যায়। নিজেদের প্রয়োজনের বাইরে পালানের অস্তিত্ব মধ্যবিত্তরা অনুভব করে না। কিন্তু এরই মাঝে যখন কোনো এক পালানের হঠাৎ মৃত্যু ঘটে তখন আপাতভাবে অস্তিত্বহীন এই পালানরাই মধ্যবিত্তের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিজের তৈরি নৈতিকতা ও তার থেকে প্রসূত অপরাধবোধের জন্যই পালান যাকে কিনা পাঁচ বছরের টুকাইও শাসন করেছে। মৃত্যুর পর পালান যেন শাসাচ্ছে। অর্থাৎ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রাণের অস্তিত্ব প্রকট হয়েছে। শ্মশানের কালো কালিতে কল্পিত লেখাগুলো জয়কে তাড়া করে বেড়ায়- 'পালানের মৃত্যুর বদলা নেব'। তাই উপন্যাসের শেষে যখন কোর্টের রায় বেরোয়-

> "ইট ওয়াজ এ কেস অফ প্লেন এন্ড সিম্পল অ্যাক্সিডেন্ট হেন্স দি কেস ইজ ক্লোসড্।"[১৭]

তখন মুক্তির আনন্দ পায় জয়দীপরা। ফাইলে গিয়ে পড়ে মামলা খারিজ হয় তবুও এক দমবন্ধ করা কষ্ট চেপে বসে জয়দীপের বুকে। পালানের হাসি মুখটা মনে পড়লেই বিচারকের রায় উপহাসের মতো শোনায়। জয়দীপরা বাড়িওয়ালা রায়বাবুর মত বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখে। নানা কারণে ভাড়াটে বাড়িওয়ালা লেগেই থাকে বছরভর। জয়দীপরা ভাবে –

> "রায়বাবু বাড়িওয়ালা, ও তো বড়লোক। আমরা দুশো টাকার ভাড়াটে। রায়বাবু আর আমাদের মধ্যে একটা বিভেদের পাঁচিল। কেউ ভাঙতে পারবে না। আমরা পরস্পরের শত্রু।"[১৮]

কিন্তু পালানের মৃত্যু উদ্ভূত নিরাপত্তাহীনতার ভয় পরস্পরবিরোধী শত্রু বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে শ্রেণি (উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত)-কে সমতলে এনে দাঁড় করিয়েছে। পালান যেন মরে গিয়ে একা লড়ছে অন্যদিকে ডাক্তার, উকিল, শিক্ষিত ভদ্রলোকরা তাকে হারাবার জন্য জোট বেঁধেছে- রাধানাথের কথাতেও তা স্পষ্ট।

উপন্যাসে দেখি সদ্য ছেলেহারানো বাবা হারান তার বুকফাটা আর্তনাদ ও অসহায়তা নিয়ে গ্রামে ফিরে গেছে। মধ্যবিত্ত মানুষগুলো পালানের মৃত্যুর দায় সমাজের উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ উপন্যাসকেন্দ্রীক চলচ্চিত্রে মৃণাল সেন দেখিয়েছেন- দাহ করে আসার পর মাঝরাতে হারান, অঞ্জন ও মমতা (জয়দীপ অদিতির পরিবর্তিত নাম)-র দিকে তাকিয়ে আছে, সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সবাই আতঙ্কিত, কারো নিঃশ্বাস পড়ছে না। তারপর হারান নিঃশব্দে চলে যায়। আসলে পালানের বাবার এই নীরবতাই তীব্র চড় কষিয়েছে মধ্যবিত্ত সমাজ মানসিকতায়। রমাপদ চৌধুরীর কথায়-

> "আসলে মধ্যবিত্ত হল সমাজের মধ্যবৃত্ত। বংশানুক্রমে যারা একটি বিশাল নাগরদোলায় বসে আছে। কখনো উপরে উঠছে কখনো নীচে নামছে, কিন্তু বৃত্তের বাইরে কদাপি নয়। এই জয়দীপ আমি এবং আপনি।"[১৯]

আমরা যাকে সমাজ বলি, মানুষ বলি, তারই নকল আয়োজন ও সাজানো সমারোহের প্রতি ধিক্কার 'খারিজ'। এখানে শুধু পালানের পোস্টমর্টেম হয়নি, তার পাশাপাশি জয়দীপ ও রায়বাবুদের স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, মিথ্যাচারিতাকে ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কেটে তার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নগ্ন দেহটাকে মেলে ধরা হয়েছে। আত্মগ্লানির দর্পণে জয়দীপদের চারিত্র্য প্রকট হয়েছে। উপন্যাসে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে স্বার্থরক্ষার খাতিরে মধ্যবিত্তের দুটি উপশ্রেণি উপরতলা ও নীচেরতলা এক হয়ে গেছে, ফুটে উঠেছে মধ্যবিত্তের অন্যতর স্বরূপ।

পরিশেষে বলতে পারি, আধুনিক বাংলার ইতিহাসে মধ্যবিত্ত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণি। মধ্যবিত্তকে যেমন কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না তেমনই মধ্যবিত্তের স্বরূপকেও বাঁধা যায় না। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ বদল এর সঙ্গে মধ্যবিত্তের বদলে বদলে যায়। এখানে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে স্বাধীনতা-পরবর্তী তিনটি উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি, যৌথ পারিবারিকতা, নর-নারীর দাম্পত্য ও সমূহ বিপদে মধ্যবিত্তের দুই স্তরের একত্ব- এই তিন প্রেক্ষিতে মধ্যবিত্তের স্বরূপ সন্ধানই মূল উদ্দেশ্য। তিনটি উপন্যাসের সব চরিত্রগুলোই নিজ নিজ ছোট পরিগণ্ডির মধ্যে বাঁচতে চায়, বাঁচিয়ে রাখতে চায় নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থবোধকে। এই স্বার্থপরতা, মিথ্যাচারিতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়, দ্বৈধতা, সিদ্ধান্তহীনতা চরিত্রগুলোকে ভিতর থেকে ফাঁপা করে দিয়েছে। মীরা-অদিতিরা ভাড়াটে থেকে বাড়িওয়ালা হবার স্বপ্ন দেখে, সমাজের উচ্চশ্রেণিতে উঠতে চায়। মৃগাঙ্ক-অবনীর মত মানুষগুলো সংসারে অর্থাভাবের মধ্যেও ইচ্ছেগুলোকে প্রাণপণে জিইয়ে রাখতে চায়। আবার 'লোকে কী বলবে' এ ভাবনা মীরার মত আর পাঁচটা মনকেও প্রভাবিত করে। মধ্যবিত্ত মানুষের একটি অন্যতম সংকট হল- এরা প্রত্যেকেই বড় হতে চায় আবার নীচে স্খলিত হবার ভয়ও এদের থাকে। ঝুটো মহত্বে-কৃপায়-উদারতায় সকলেই সকলকে ছাপিয়ে উঠতে চায়। লোকচক্ষুর ভয়, দ্বিধা, সংশয়, নিরাপত্তাহীনতা, দুর্বল মানসিকতার বীজ মধ্যবিত্ত রক্তের মধ্যেই প্রোথিত, দীর্ঘকাল ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে যা আজও প্রবহমান।

'চেনামহল', 'মীরার দুপুর', 'খারিজ' পড়তে পড়তে মনে হয় এই দ্বন্দ্ব, জটিলতা, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা হয়তো আমাদের মধ্যেও ক্রিয়াশীল। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমরাও দ্বৈধতায় পড়ি। আমরাও প্রায়শ সহজে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনা, উচ্চবিত্তের শ্রেণিতে উঠতে চাই, পাঁচজনের কথায় কান দিই, কে কী ভাববে তা নিয়ে ভাবি, নিজকৃত অপরাধের বোঝা

অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাই- এসব লক্ষণ থাকলে আমরা মধ্যবিত্ত। উনিশ শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমাজের এই মধ্যবিত্তের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে, সমানতালে ভাঙা-গড়ায় মধ্যবিত্তের নানা মুখও ভেসে উঠেছে। অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে যৌথ পারিবারিকতা, নর-নারীর ঘুণধরা দাম্পত্য, আসন্ন বিপদকালে সমাজের দুটি শ্রেণির একত্ব এই তিন প্রেক্ষিতে এ তিন উপন্যাস মধ্যবিত্তের মুখ ও মুখোশকে স্পষ্ট করে দিয়ে স্বরূপ প্রকাশে সার্থক হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. Pollard, A.F, Factors in Modern History, Constable & Company Ltd, London, $WC_{2,}$ Southwark Bridge Road, London S.E.I, Third Edition, Reprinted ১৯৪৫, পৃ. ৪৩
২. ঘোষ, দীপেন, বাংলার মধ্যবিত্ত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা ৭৩, সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃ. ৬
৩. https://en.m.wikipedia.org/wiki/English_Education_Act_1835
৪. চক্রবর্তী, জয়া, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথাসাহিত্য, এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ১০৩-০৪
৫. মিত্র, নরেন্দ্রনাথ, চেনামহল, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, ২১ নভেম্বর,২০১০, পৃ. ৩৩
৬. তদেব, পৃ. ১৫২
৭. তদেব, পৃ. ১৫৪
৮. তদেব, পৃ. ১৬৫
৯. তদেব, পৃ. ১৭২
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, নীল রাত্রি ও বনের রাজা, পত্রপত্রিকায় আলাপ-আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সংকলক, প্রতাপকুমার সেন, অনুষ্টুপ, প্রাক্ শারদীয় ২০০৯, অনিল আচার্য, ১৩০ কেশবচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ০৯, পৃ. ৩০৩
১১. নন্দী, জ্যোতিরিন্দ্র, মীরার দুপুর, অনুষ্টুপ, প্রাক শারদীয় ২০০৯, অনিল আচার্য, ১৩০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ০৯, পৃ. ১৮৮
১২. তদেব, পৃ. ১১৯
১৩. তদেব, পৃ. ১১০
১৪. তদেব, পৃ. ১১৩
১৫. চৌধুরী, রমাপদ, খারিজ, আনন্দ পাবলিশার্স, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ০৯, পঞ্চম মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ১১
১৬. তদেব, পৃ. ৬০
১৭. তদেব, পৃ. ৬৬
১৮. তদেব, পৃ. ৫০
১৯. চৌধুরী, রমাপদ, আমরা সবাই, শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮০, পৃ. ১